ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 08. No. 01. February 2013

মধুসূদনের কাব্যে নারী: আধুনিক ভাবনা

ড. মো. ইব্রাহিম আলী*

সারসংক্ষেপ: মধুসূদনের সাহিত্য জীবন শুরু হয় নারী প্রশস্তির যুগে। বাংলাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলন লক্ষ্য করা যায় উনিশ শতকের প্রথমদিকে। রেনেসাঁসের মানব-মন্ত্রে উজ্জীবিত মনীষীগণ নারীকে সামাজিক মিথ্যা সংস্কারের জ্বলন্ত-চিতা থেকে উদ্ধার করে তাদের অধিকার ও মূল্য নির্ধারণে সচেষ্ট হন। মধুসূদন তাঁর রচনাতে নারীকে গার্হস্থ্য-ধর্ম, পুরুষের পণ্য এবং দেব-পুজার উপাচার না করে সাহিত্যিক মহিমায় বিভূষিত করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর রচনাতেই নারী প্রথম স্বতন্ত্র্য মর্যাদা লাভ করে, হয়ে উঠে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। *ক্যাপটিভ লেডি* থেকে আরম্ভ করে *চতুর্দশপদী কবিতাবলী* পর্যন্ত বিভিন্নভাবে নারীর সমগ্র রূপকে তিনি বর্ণনা করেছেন সচেতনভাবে। তাই মধুসূদনের কাব্যে সচেতন নারীর স্বরূপ সন্ধানের লক্ষ্যেই প্রতিপাদ্য নিবন্ধের অবতারণা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে নারীজাগরণের এক ক্রান্তিলগ্নে। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ফলে বাংলায় যে নব জাগরণের সূচনা হয় তাতে স্নাত হন এখানকার সূর্য-সন্তানগণ। রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) আত্মীয় সভা (১৮১৫) ও ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং সতীদাহ প্রথা (১৮২৯) উচ্ছেদের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কার আন্দোলন ও নারীমুক্তি আন্দোলনের শুভ সূচনা ঘটলেও কালে তা পরিণতি লাভ করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯৩) জীবনে ও সাহিত্যে এ আন্দোলন বিশেষ কর্মযজ্ঞ হিসেবে দেখা দেয়। মধুসূদনের সাহিত্যে নারী বিশেষ ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয়। তাঁর কাব্যে এ সম্পর্কিত উপলব্ধির পশ্চাৎপট হিসেবে তাঁর যুগভূমি ও ব্যক্তি-জীবনের দিকে তাকানো যায়।

ভারতীয় মনীষীরা নারীকে গৃহদীপ্তির স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। *প্রাকৃত পৈঙ্গল* নামক অপভ্রংশ গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার একটি পরিবারের চমৎকার ছবি চিত্রিত হয়েছে:

ওগ্গর-ভত্তা রম্ভঅ পত্তা, গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুত্তা।
মইলি মচ্ছা নালিচা গচ্ছা, দিচ্ছই কন্তা খা পুণ বন্তা।

এর ভাষান্তর করলে দাঁড়ায়-

"প্রিয় পত্নী কর্তৃক, কলার পাতে ওগরা (ডাল-চাল সংযোগ রান্না করা খিচুড়ি) ভাতের সঙ্গে ঘি, নালিচার শাক, মৌরলা মাছ ও দুগ্ধ পরিবেশিত হচ্ছে, পূণ্যবান স্বামী তা খান।" – সেকালে এরকম গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেই নারী মহিমান্বিত ছিল। অর্থাৎ কবিরা নারীকে জায়া ও জননীরূপে বন্দনা করেছেন, কিন্তু নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে তার স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়েছিল।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী কলেজ।

সেকালে নারীর অবস্থা ইউরোপেও শোচনীয় ছিল। রেনেসাঁসের কালেই সেখানে নারী জাগরণ দেখা দিয়েছিল। এ রেনেসাঁসের ফলেই নারীর জীবনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। উচ্চ পরিবারের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। কোনো কোনো নারী জনসমক্ষে দার্শনিক বিষয়ে আলোচনায় যোগ দেয়- যেমন ভেনিসের কাসান্দ্রা, কস্টাঞ্জা-ভারানো, ভেরোনিকা গাম্বার কিংবা ভিত্তোরিয়া কলোন্না কবিতার ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন। জীবনের সবক্ষেত্রেই তাঁরা বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখলেন।

বাংলাদেশের হিন্দুসমাজে কৌলীন্য প্রথা, বাল্য বিবাহ, সতীদাহ, বহু বিবাহ সমস্ত মিলিয়ে যে মরণ জালের সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে নারীর অবরুদ্ধ জীবন হয়ে উঠেছিল বেদনার্ত। বহু বিবাহের ফলে নারী হয়েছে নিষ্পেষিত, অবহেলিত। এর ফলে শিশু ও সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা বিধবাদের করুণ কান্না সর্বত্রই প্রতিধ্বনিত হত। এ কান্নার সুর বিদ্যাসাগরের কানে বেজেছিল গভীর বেদনায়। বহু বিবাহ নিরোধ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের একটি রোমাঞ্চকর তালিকা দিয়েছেন। ৬৫, ৬৪ এবং ৫৫ বছর বয়স্ক লোকেরা যথাক্রমে ৮০, ৭২ ও ৬২ টি বিবাহ করেছেন।

সতীদাহ প্রথা বিলোপ ও নারীকে এ পণ্যদ্রব্য থেকে মানুষের স্তরে আনবার সাধনায় প্রথম পুরুষ অবশ্য রামমোহন রায়। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। রামমোহন রায়কে মধুসূদন দেখতে পাননি। কিন্তু তাঁর ভাবপরিবেশের মধ্যে তাঁর জন্ম। রাধাকান্ত দেব, বেথুন, বিদ্যাসাগরের সাধনা তাঁর জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহ নিরোধ, স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের চিন্তাশীলকেই নাড়া দিয়েছিল। বিদ্যাসাগরের অসাধারণ অবদান এক্ষেত্রে অবশ্যই স্বীকার্য। মধুসূদনও ছাত্রাবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা সমন্ধে প্রবন্ধ লিখে পুরুস্কার লাভ করেন। তিনি লেখেন-

> I may say in all oriental countries women are looked upon as created merely to appelitis of man... The people of this country do not know pleasure of domestic life, and indeed they can not until civilization shows then the way to attain it.[১]

এ ভাব পরিমণ্ডলে একদিকে প্রগতিশীলতার আকর্ষণে সংবাদ পত্রে শিক্ষিত বাঙালি তার মুক্ত মত ব্যক্ত করেছে। অন্যদিকে রক্ষণশীলতার বেদনা ও ব্যঙ্গ ঈশ্বরগুপ্তের মত লোকের লেখনিতে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ধারণা লেখাপড়া শিখে নারী তার নিজস্ব মহিমা হারিয়ে ফেলবে। তাই তাঁর প্রশ্ন:

আর কি এরা এমন কোরে, / সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে?
আর কি এরা আদর কোরে, / পিঁড়ি পেতে অন্নদেবে?

রামমোহন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে নারী আন্দোলনের যোগ বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়েরই। '*কুলীনকুল সর্বস্বে*'র লেখক- রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রাণেও সেই বেদনা সৃষ্টির মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই সর্বব্যাপক আন্দোলনের মধ্যেই মধুসূদনের সাহিত্য সাধনা। রঙ্গলালের কবিতায়, হেম-নবীনের রচনায় সেই নারী-স্বাতন্ত্র্যের রূপ আবিস্কারের চেষ্টা দেখা গেছে। তাকে আরো পূর্ণ

করেছে সুরেন্দ্র মজুমদারের *মহিলাকাব্য* এবং বিহারীলালের *নারীস্তোত্র*। মধুসূদন নারী আন্দোলনের নায়কত্ব করেছিলেন সাহিত্যে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত উনিশ শতকের রেনেসাঁসের সন্তানই শুধু নন, তিনি এ শতকের প্রগতিবাদের সাথে একাত্ম হয়ে জীবন ও সাহিত্যে তার চর্চা করেছিলেন। মধুসূদনের মধ্যে সংস্কার ছিল না, ধর্মীয় বা সামাজিক কোনো দিক থেকেই তিনি সংস্কারের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেননি। প্রচলিত সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যুগের হাওয়ায় অবগাহন করেছিলেন।

সমাজ ও যুগ পটভূমির সাথে মধুসূদনের সাহিত্য-মানস গঠনে তাঁর ব্যক্তি-জীবনও একটি অন্যতম অনুসঙ্গের পরিচায়ক। মধুসূদনের জীবনে যে ক'জন নারী তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান তাঁর জননী জাহ্নবী। তাঁর বাল্যশিক্ষা, মাতৃভাষা প্রীতি, ঐতিহ্যের প্রতি কৌতূহল সমস্তর মূলে জননী। জননীর সঙ্গে বিচ্ছেদ-স্মৃতি তাঁর জীবনে একটি নির্জন ব্যথার তীর্থরূপে আমৃত্যু বিরাজিত ছিল। রাজনারায়ণ দত্তের বহু বিবাহের ফলে জননীর যে অসম্মানবোধ হয়েছিল তা মধুসূদনের অবিদিত ছিল না।

স্মরণীয় যে মধুসূদনের বিয়ে হতে যাচ্ছিল একটি অল্পবয়স্কা জমিদার কন্যার সঙ্গে। তাঁর মন তাতে সায় দিতে চায়নি। লক্ষ্য করা দরকার যে মধুসূদন বিশ্বাসী ছিলেন স্বাধীন প্রেমে। রেবেকা ও হেনরিয়েটা তাঁর জীবনে এসেছিলেন নবীন অভিজ্ঞতার আস্বাদ বহন করে। সহজ কথায় নারীর স্বাতন্ত্র্য ও মূল্য সম্পর্কে তাঁর একটি নিজস্ব বোধ গড়ে উঠেছিল। সেই নারী ছিল তাঁর কল্পনায়। তাকে তিনি খুঁজেছেন কাব্যে ও জীবনে। মধুসূদনের সাহিত্যে এর বীজ রোপিত হয়েছিল তাঁর সাহিত্য চর্চার উষালগ্ন থেকেই। ইংরেজি ও বাংলা কাব্য কবিতাতেই শুধু নয় তাঁর নাটক ও প্রহসনগুলোতেও নারী স্বতন্ত্র্য মর্যাদার অধিকারী। *একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ* প্রহসন দু'টিতে নারীর সামাজিক অবস্থানের চিত্র এবং নারীর মূল্য সম্পর্কে মধুসূদনের অভীপ্সাও লক্ষণীয়। *একেই কি বলে সভ্যতা* প্রহসনে নবকুমারের জবানীতে পশ্চাত্য-শিক্ষা-পুষ্ট-কবি মুক্ত মন নিয়ে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন:-

> জেন্টেলম্যান, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরস্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রী হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েছে, এখন আমার প্রার্থনা এ যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর। [২]

এ উক্তি লেখকের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মাত্র নয়, সুস্পষ্ট এবং সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিশেষ সমাজ-তাত্ত্বিকেরও পরিচয়বাহী। আর এ সোসীয়াল রিফরমেশনের মধ্যে নারীর স্বতন্ত্র্য মূল্য নির্ধারণ সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং ব্যঞ্জনাবাহী- যা নবকুমারের উক্তিতে প্রকাশিত:-

> জেন্টেলম্যান তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর- তাদের স্বাধীনতা দেও, জাতভেদ তফাৎ কর -আর বিধবাদের বিবাহ দেও- তাহলে এবং কেবল তাহলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে-নচেৎ নয়।[৩]

এর পাশাপাশি নারী সমাজের করুণ অবস্থাও বর্ণিত। হরকামিনীর সংলাপে এ দিকটি লক্ষ্য করা যায়,

> ও ঠাকুর ঝি, এ ভাই তোর দাদার দশা দেখ্ । হায়, এ কল্‌কেতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এরূপ যন্ত্রনা ভোগ করে তার সীমা নাই। হে বিধাতা! তুমি আমাদের ওপর এত বাম হলে কেন?[৪]

কিন্তু পরক্ষণেই হরকামিনী বলেছে, 'তা ভাই দেখ দেখি এমন স্বামী থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি।'[৫]

স্বামীর এ থাকা না–থাকার কথা বলতে পারার মধ্যেই মধুসূদনের নারীর অগ্রগামিতা। স্বামী সম্পর্কে এত বড় স্পষ্ট মতামত প্রকাশ সেকালে ছিল অসম্ভব।

মধুসূদনের সাহিত্যের একটি বড় বৈশিষ্ট এ যে, তার অধিকাংশ কাব্য ও নাটক নারী প্রধান। তাঁর দু'টি প্রহসন, মহাকাব্য ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী ছাড়া অন্যান্য নাটক ও কাব্য নারীর শিরোনামে চিহ্নিত। *শর্মিষ্ঠা* নাটক, *পদ্মাবতী* নাটক, *কৃষ্ণকুমারী* নাটক, *তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য*, *ব্রজাঙ্গনা কাব্য*, *বীরাঙ্গনা কাব্য*, নারী নামকেন্দ্রিক। *তাছাড়া ইংরেজিতে* Captive ladie কাব্য এবং *Rizia* কাব্য নাটকে নারী শিরোভূষণ। *মেঘনাদ বধ কাব্য* কবির প্রিয় ইন্দ্রজিতের নামাঙ্কিত হলেও- এখানে প্রমীলা, চিত্রাঙ্গদা, সীতা উজ্জ্বল চরিত্র। এছাড়াও ইংরেজি লিরিক, সনেট এবং বাংলা চতুর্দশপদী কবিতাবলীর অনেক স্থানেই নারী কবির সহানুভূতিতে দীপ্ত।

মধুসূদনের মাতৃভাষাতে যে দু'টি বিশুদ্ধ গীতিকবিতার সন্ধান মিলে তার মধ্যে নারীর প্রসঙ্গ একেবারেই অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর ইংরেজিতে বেশ কিছু লিরিকের সন্ধান মিলবে যা শৈল্পিক সুষমায় বিভূষিত। বিচিত্র ভাববিন্যাস দেহ গঠন করেছে এসব লিরিকের শরীর। নারী প্রসঙ্গও তার মধ্যে উল্লেখ্য। এখানকার নারী কোনো চরিত্র শিরোনামে নয়, কবি হৃদয়ের ব্যক্তি অনুভূতিতে অশরীরীরূপে সৃষ্ট, তারা কবির মানস-প্রিয়া, প্রেমিকা। এসব প্রেমিকা নারীর স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন প্রেক্ষিতে বিচার্য।

মধ্যযুগের গীতি কবিতায় নারী প্রেম চাঞ্চল্যে বিদীর্ণ, কিন্তু স্রষ্টাভাবে ভাবিত (প্রসঙ্গত বৈষ্ণবপদাবলীর রাধা)। এ যুগের কাব্যে কোনো কোনো স্থানে নর-নারীর বার্ণিল প্রেম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ফেনিল কামনা অথবা স্থূল রসের পরিচয় তাতে লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজি ভাষাতে হলেও বাঙালি কবিদের মধ্যে মধুসূদনই প্রথম নিজেকে প্রিয়া-প্রেমে দগ্ধীভূত করলেন, অন্তর বেদনায় বিকশিত করলেন। প্রিয়া বিচ্ছেদের বেদনা তার আগে কেউ এত করুণ ভাবে উপলব্ধি করে প্রেমকে মর্যাদা দেয়নি। ব্যক্তি প্রেমের দ্বন্দ্বে মধুসূদনের অন্তরে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, সেই চাঞ্চল্য থেকেই প্রেমিকারূপী নারী লাভ করেছে উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য।

The Upsori কাব্যে স্বর্গের অপ্সরা মর্ত্য সন্ন্যাসীর নিকট প্রেমকামনায় ছুটে এসেছে। অপ্সরারূপী নারীর এ রূপটিতেও নারী সম্পর্কিত ভাবনায় কবির মনোভাব প্রতিফলিত। কারণ এর পূর্বের অনেক কাব্যেই স্বর্গের অপ্সরাকে মর্ত্যমানুষের প্রতি প্রেম নিবেদন করতে দেখা গেছে। কিন্তু নিছক প্রেম নিবেদনের জন্য পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটেনি, বরং দেবতাদের ইচ্ছায় অথবা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এক্ষেত্রে তারা অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য

পুরুরবার প্রতি উর্বশীর প্রেম নিবেদন এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্বর্গের অপ্সরার হৃদয়ে এরকম মানবিক প্রেমের সংযোগ ঘটানোর ফলে অপ্সরাও পেয়েছে নারীত্বের মর্যাদা এবং হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল মহিমায় মহিমান্বিত।

ক্যাপটিভ লেডির সংযুক্তা বন্দিনী নারী। এ বন্দীদশাতেই তাঁর হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হয় প্রেমের প্রদীপ্ত শিখা। এ প্রেম বীরত্বের প্রতি আনুগত্য। তাই নায়িকা সংযুক্তা পিতার আত্মসম্মানবোধের দিকে তাকাননি, বরং প্রেমাস্পদের সাথে মিলন কামনায় ছুটে যান দিল্লীশ্বরের নিকট। এখানে স্বাধীন প্রেম এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিয়ে করার মধ্যে নারী উজ্জ্বল। এটি কবি মধুসূদনের জীবনাবেগ ও জীবনদর্শনের পরিচায়ক।

এ কাব্যের রাজসূয়যজ্ঞের সময় জনৈক গায়কের কণ্ঠে রামায়ণের সীতা প্রসঙ্গ এসেছে। সীতা মধুসূদনের সাহিত্যিক জীবনে এক বিরাট অংশে পরিব্যাপ্ত। তাঁর কাব্যে সীতা শাশ্বত বঙ্গ নারীর প্রতীক। এ কাব্য থেকে *মেঘনাধ বধ কাব্য* ও *চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে*ও সীতা স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

রিজিয়া কাব্য নাট্যে রিজিয়ার নারী সত্তা উজ্জ্বল চৈতন্যে উদ্ভাসিত। আমীর-ওমরাহ ও প্রাসাদ চক্রান্তে বন্দিনী নারীর মুক্তি কামনার মধ্যে নারীত্বের অপূর্ব বিকাশ লক্ষণীয়। শিরিন এবং লীনাও রিজিয়ার পাশে দুটি স্বাতন্ত্র্যময়ী চরিত্র।

*শর্মিষ্ঠা নাটক*ই(১৮৫৯) মধুসূদন দত্তের বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বর্ণফসল। এ নাটকের মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আগমন ঘটে। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতি চরিত্র তাঁর নাটকের উজ্জ্বল উদ্ভাসন। এ নাটকগুলোর মধ্যেই তাঁর নারী সম্পর্কিত দার্শনিকতার বীজ প্রথম উপ্ত হয়েছিল। এ বীজ পূর্ণ প্রস্ফুটিত আকার লাভ করে তাঁর কাব্যে।

তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে নারীর স্বাতন্ত্র্য খোঁজা যেতে পারে কবির রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তরালে। আর এজন্যই একাব্যে সুন্দ উপসুন্দের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপের চেয়ে 'তিলোত্তমার আত্মরতি ও অভিসার প্রাধান্য পেয়েছে।' রঙ্গলাল *পদ্মিনী উপাখ্যানে* সতীরমণীর চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে তাঁর আদর্শ নারী বর্ণনা সার্থক করেছেন। অন্যদিকে মাইকেল-

বিরাজিছে ফুল-কুল-মাঝে একাকিনী/ দেবদূতী, ফুলকুল ইন্দ্রানী যেমতি
নলিনী! কমল-করে আদরে রূপসী/ ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শতগুণ, যথা রবির কিরণে/ মণি আভা।[৬]

কবি এমনই এক রহস্যময়ী রমণীমূর্তী আঁকতে চেয়েছেন। নিরবিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য অনুধ্যানই তাঁর লক্ষ্য। ইতোপূর্বে রমণীরূপ যে বাংলা কাব্যে বর্ণিত হয় নি, তা নয়। বরং অতিশয়ই বর্ণিত হয়েছে। খুল্লনা, লহনা, রঞ্জনাবতী, বিদ্যার বর্ণনার মধ্যে শরীরী ভোগ-বাসনার অংশটাই ছিল বেশি। শুধু সৌন্দর্য-সম্ভোগ বাংলা কাব্যে এতকাল ছিল অনুপস্থিত। বিশেষ করে মধুসূদন পূর্ববর্তী যুগের কবিরা স্থুল দেহ বিলাসের পঙ্কে পড়ে সৌন্দর্যবোধ লালসার নামান্তর হয়ে পড়েছিল। মধুসূদন সেই ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে সৌন্দর্য পূজাকে উদ্ধার করলেন, তাকে শুচিময় করলেন। নারী সৌন্দর্য-বিলাসের ভোগ-বাসনা ত্যাগ করে হয়ে উঠলো শুভ্র সৌন্দর্যময়ী।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে রূপজমোহে সুন্দ উপসুন্দের আত্মধ্বংস ঘটেছে। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও এর প্রভাব লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র রূপজমোহের কারণে তাঁর নায়কদের পরিণতি সাধন করেছেন। নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, সীতারাম- এদের ট্রাজেডির মূলবীজ যথাক্রমে কুন্দনান্দিনী, রোহিনী এবং শ্রী'র রূপবহ্নি। মধুসূদনের তিলোত্তমার স্বাতন্ত্র্য সেখানেই-যেখানে তিলোত্তমা দৈব প্রয়োজনে সৃষ্টি, দৈব প্রভাব চরিত্রটির সর্বত্রই ব্যাপ্ত। অথচ কবির সৃষ্টি কৌশলে এবং মানস সহানুভূতিতে সেই চরিত্রটিও হয়ে উঠেছে মানবীয় মহিমায় উজ্জ্বল। এ নারী রোহিনীর চেয়েও নম্র, লজ্জাশীলা:-

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর- গামিনী/ তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ / লজ্জাশীলা।[৭]

ব্রজাঙ্গনা কাব্য মধুসূদনের স্বাভাবিক কবি ধর্মের বিপরীত কোটিতে সৃষ্টি। একাব্যের বিষয় পুরনো হলেও- এর বিন্যাস আধুনিক এবং ওডের কাব্যরীতির অনুগত। এ কাব্য তৎকালীন ইংরেজি শিক্ষিত পাঠক ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী উভয়েরই নিকট নিন্দা অথবা প্রশংসা পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কবি বন্ধু-রাজনারায়ণ বসুকে বলেছিলেন, 'ধর্মান্ধতা দূরে রেখে কাব্য পাঠ কর। শ্রীমতী রাধা আসলে মেয়ে খুব খারাপ নয়।'[৮] - এ উক্তির মধ্যেই রাধা তথা নারীর প্রতি কবির শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব স্পষ্ট।

ব্রজাঙ্গনা'র রাধাকে মধুসূদন নতুন করে চিত্রিত করার জন্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে রাধা বৈষ্ণব পদাবলীর ধর্মাশ্রিতা নারী নন- এক প্রেমিকা নারী, যিনি প্রেমিকের প্রতি আকুলা, প্রেমে যাঁর গভীর অনুভূতি। ব্রজাঙ্গনার রাধা মধুসূদনের নিকট মিসেস্ রাধা (Mrs. Radha)।

এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে!
ভালে যে সিন্দুর বিন্দু, হইবে চন্দন বিন্দু;-
দেখিব লো দশ ইন্দু
সুনখগনে
চির-প্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে![৯]

রাধার 'ভালে যে সিন্দুর বিন্দু' এবং হবে 'চন্দন বিন্দু' এর মধ্যে বিদ্রোহ আছে- যা রাধাকে নতুনত্ব দিয়েছে।

মেঘনাধ বধ কাব্যে'র নারী চরিত্রগুলোতে নতুন সত্তা ও বৈশিষ্ট্য আরোপ করে মাইকেল আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অধঃপতিত, অসভ্য, অর্ধসভ্য সমাজে যখন ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বঙ্গ-নারীগণ বার বার অত্যাচারিত হচ্ছিল, ঠিক তখনই তাঁর সৃষ্টি নারীরা এক অপরূপ স্বকীয় মাধুর্যে আবির্ভূত হল।

মেঘনাধ বধ কাব্যে প্রথম যে নারীটির সাথে আমাদের পরিচয় হয়- সে চিত্রাঙ্গদা। সে রাবণের একাধিক মহিষীর মধ্যে একজন। পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকাগ্রস্তা অবস্থায় রাজ দরবারে তার সাক্ষাৎ মেলে। মোহিতলাল মজুমদার চিত্রাঙ্গদাকে 'স্নেহানুগ্রহধন্য', 'স্বামী স্নেহবঞ্চিতা', 'রাবণের বিশাল রাজপুরিতে অবহেলিত' প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেছেন। এ বিশ্লেষণে তার চরিত্রের একদিকের মূল্যায়ন হয়েছে বটে- কিন্তু পরিপূর্ণ করেনি। কারণ *মেঘনাধ বধ কাব্য* যে কালের

কাহিনী সেই কালের নারী চরিত্র থেকে চিত্রাঙ্গদা অবশ্যই স্বতন্ত্র্য। তাই চরিত্রটির ভিন্ন প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু রমণীর নিকট স্বামী ছিল দেবতা, তার কোনো অপরাধ থাকতে পারে না, তার প্রতি কোনো অভিযোগ মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা- মনে আনাও পাপ। কিন্তু মধুসূদন এ আদর্শের অনুবর্তী হয়ে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটি চিত্রিত করেননি। কোনো প্রাচীন সংস্কার বা আদর্শ এ চরিত্রটির মুখ আটকে দেয়নি। তাই তো চিত্রাঙ্গদা স্বীয় পুত্রের শোক নিবারণ না করতে পেরে স্বামীর ওপর অভিযোগ এনে বলেছে-

কে, কহ, এ কাল অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি/ লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।[১০]

-এ চরিত্রটি মধু-মানসের সাক্ষাৎ প্রতিফলন।

প্রমীলা চরিত্রটি *মেঘনাথ বধ কাব্যে'র* সবচেয়ে উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যময়ী এবং নায়িকা চরিত্র। তৃতীয় সর্গে প্রমীলার পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে-

প্রমোদ উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী/ প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।[১১]

-মেঘনাদের যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরতে দেরি হবার জন্য তার এ অবস্থা। কারণ সে প্রেমিকা, স্বামী-প্রাণগতা। কিন্তু এটি শুধু তার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, সে কবির মানসজাত বীরাঙ্গনা নারী, নারী মুক্তির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। কারণ ইউরোপের ইতিহাসে এবং কাব্যের মধ্যেও এ নারীর স্বপ্ন তিনি দেখেছেন। প্রমীলা রেনেসাঁসের আদর্শ নারী। ইটালির ইতিহাসে তখন দেখা গেছে ইসাবেলা রাজ্য চালিয়েছেন, ক্যাটারিনা বর্মাবৃতা হয়ে যুদ্ধে গেছেন, বিয়ানকা মারিয়া ভিসকনতি মিলানের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। মধুসূদনের মন এদের সন্ধান করেছে: 'কোথা সে রমণী বীর্যবতী, কোষ বিমুক্ত কৃপাণ লতা।' মধুসূদনের স্বপ্নের এটি আর একটি দিক।

মধুসূদন যে বীরাঙ্গনা নারীর স্বপ্ন দেখেছিলেন সে বীর্যবতী কিন্তু তার বীর্য সৌন্দর্যবিহীন নয়। শক্তি ও সৌন্দর্যের, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের যে সমন্বয় ছিল তাঁরই আকাঙ্ক্ষা, তারই নাম বীরাঙ্গনা। প্রমীলা ছাড়াও– *বীরাঙ্গনা কাব্যে'র* নায়িকাদেরও কবি বীরাঙ্গনা বলতে চেয়েছেন।

প্রমীলা নারীর বীর্য ও সৌন্দর্যের সংমিশ্রণে কবির মানস নারীর রূপ। তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা পুরুষের সহযোগী করেছে, প্রতিযোগী করেনি। প্রমীলা সখি বাসন্তীকে লঙ্কাতে যাওয়ার কথা বলায় বাসন্তী বিস্মিত হয়েছে। সে তাকে লঙ্কা যাবার অন্তরা পথের কথা বুঝিয়ে বললে প্রমীলা তেজস্বিনী কণ্ঠে বলেছে-

কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি/ বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি/ দানব নন্দিনী আমি, রক্ষকুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,-/ আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?[১২]

যে অসম সাহসিনী ও বীর্যবতী- সে এরকম ব্যক্তিত্বের স্পর্ধাতেই কেবল লঙ্কা প্রবেশ করতে পারে। এ ব্যক্তিত্বের আরোপে মধুসূদনের প্রমীলা স্বতন্ত্র্য রূপ লাভ করে। আর একারণেই স্বামী মিলনাকাঙ্ক্ষী- প্রমীলা বলতে পারে-

পশিব নগরে/ বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে,–এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম;/ নতুবা মরিব রণে-যা থাকে কপালে।[১৩]

প্রমীলাকে রণে মরতে হয়নি। কবির নিকট চরম ঘৃণিত রামও নারীর প্রতি পরম শ্রদ্ধাবনত। চরম শত্রু-পত্নীর প্রতিও তিনি কিছুমাত্র অসম্মান বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নি।

মধুসূদন মঙ্গলকাব্যের ন্যায় অথবা পদাবলীর রাধার ন্যায় নারীর ভক্তিরূপ অঙ্কন করতে বসেন নি। তিনি প্রমীলা চরিত্রে বীর্য এবং শৌর্যের সঙ্গে নারীর প্রেমময়ী দিকটি অঙ্কন করেছেন। তাই প্রমীলার স্বামী সঙ্গে সহমরণে যাবার মধ্যে হিন্দু সমাজের প্রথা সেখানে বড় হয়ে উঠেনি, বরং বিধবা নারীর স্বামী সঙ্গ পরিত্যাগের দুঃসহ যন্ত্রনা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে এ সহমরণ যাত্রা। এর মধ্যে ছিল প্রমীলার অদম্য প্রেম। প্রেমের এ বৈশিষ্ট্য বহন করবার জন্যই প্রমীলা উনিশ শতকের নতুন নারী। এ নতুনত্ব আরোপের ক্ষেত্রে *বীরাঙ্গনা কাব্যে'র* চরিত্রগুলো আরো স্পষ্ট।

তার হৃদয় রহস্যের অস্পষ্ট আলো অন্ধকারেও কবির দৃষ্টি। মেঘনাদ বধ কাব্যের পঞ্চম সর্গে প্রমীলাকে সেই রূপেই দেখা যায়। এ সর্গের প্রথম দিকে যেমন মেঘনাদকে হত্যার জন্য স্বপ্নে নানা কৌশল বর্ণিত হয়েছে, তেমনি মেঘনাদ-প্রমীলার প্রেমময় দাম্পত্য ছবিও উন্মোচিত। এ রাত্রির পরই মেঘনাদের মৃত্যু। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে-

প্রমীলার কর পদ্ম, কর পদ্মে ধরি/ রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায়রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া/ প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) ডাকিছে কূজনে/ পাখীকুল। হৈমবতী ঊষা তুমি রূপসি
আমার, মেল, প্রিয়ে, কোমল লোচন;/ উঠ চিরানন্দ মোর। .....
.....

চল প্রিয়ে-এ-বে/ বিদায় হইব নমি জননীর পদে।[১৪]

এটি মানুষের প্রেম-স্নিগ্ধ মুহূর্তের অঞ্জলি পূর্ণ করে পান করে নেবার ছবি। মেঘনাদের জীবন শেষ হয়ে এল। পাখিরা ডাকছে। নক্ষত্রগুলো নিভে গেছে। এ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও থরথর প্রেমের জাগ্রত শিখা। মৃত্যুর প্রবল বাতাসে সে শিখা যতই কেঁপে উঠছে এ কাব্য প্রকোষ্ঠে ততই মানবমূর্তিগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কালের ধূসর আবরণ ক্লাসিকতার ছদ্মবেশ সব হারিয়ে দীর্ঘ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে কেবল প্রেমিক কণ্ঠ।

মেঘনাদ বধ কাব্যের আর একটি উজ্জ্বল নারী চরিত্র মন্দোদরী। কিন্তু কবিজনোচিত স্বভাব তার চরিত্রে অনুপস্থিত। এ চরিত্রের মাহাত্ম্য মাতৃত্বে। সর্বোপরি নারী সুলভ বিকাশই তার চরিত্রকে উজ্জ্বল করেছে। তার মাহাত্ম্য বর্ণনায় ফুটে উঠেছে:

শরদিন্দু পুত্র, বধূ-শারদ-কৌমুদী/ তারা কিরীটিনী নিশি সদৃশী আপনি
রাক্ষস কুল-ঈশ্বরী।[১৫]

পুত্র-পুত্রবধূর প্রতি স্নেহ বৎসল্যে মন্দোদরী বিভীষণের প্রতি ধিক্কার দিয়েছে পুত্রের বিপদাশঙ্কায়-

কাল সর্প-সম/ দয়াশূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে/ ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি/ স্বশিশু।[১৬]

আবার পুত্র স্নেহের কারণেই সূর্পনখার প্রতি তার বিরূপ মনোভাব,'হায়, বিধি কেন না মরিল / কুলক্ষণা সূর্পনখা মায়ের উদরে'।

কাব্য মধ্যে এক নাটকীয় আবর্ত সৃষ্টি করে মধুসূদন সূর্পনখাকেই এ যুদ্ধের জন্য দায়ী করেছেন। তাই মাতৃসম মন্দোদরীর মুখ থেকে মেয়ের প্রতি এ মৃদুভর্ৎসনা। আমরা মনে করি কবি যথার্থই নারীর অবমাননাকে উপলক্ষ্য করেই এত বড় আয়োজন করেছেন। লক্ষণ সূর্পনখাকে অপমান করেছে বলেই সীতা হরণ প্রয়োজন হয়েছে। তাই কাহিনীর পৌরাণিক আবেদনকে নতুন করে আধুনিক দৃষ্টিতে সাজানো হয়েছে।

কনক লঙ্কা ধ্বংস আশঙ্কায় ও পুত্রের আসন্ন বিপদ দৃষ্টে মাতৃহৃদয় এবং জননীর দীর্ঘশ্বাস যেন রাবণের ওপর পড়েছে-

কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী/ ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনুরে তোরে!
এ কনক লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি।[১৭]

মন্দোদরীর এ উক্তির মধ্যে চিত্রাঙ্গদার 'মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি'- বাক্যের ভাব সাদৃশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মন্দোদরীর উক্তি নারী সুলভ সৌন্দর্যের পরিপন্থি নয়। এমনকি বিভীষণ ও সূর্পনখার প্রতি উক্তিও একই সত্যে বিধৃত। এখানে তার জননীরূপটি বিচিত্র ব্যঞ্জনায় অনুরণিত। অনুমান করা যেতে পারে- মধুসূদনের দীর্ঘদিনের মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হৃদয় যেন মা জাহ্নবীর ছবি অঙ্কন করতেই এখানে অধিক তৎপর। মেঘনাদের মৃত্যুর পর নির্বাক, নিস্তব্ধ দেবারাধনা যেন কবির জননীর নীরব কান্নারই সামিল। কোথাও এ চরিত্র জননী ও মাতৃত্বের মহিমা হারায় নি। ক্লাসিক শিল্প রূপায়নে এ চরিত্রটির মাহাত্ম্য প্রকাশে কবি নব্য-মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছেন। কারণ তার আগের রচনাগুলোতে মাতৃত্বের এ অপরূপ মহিমা প্রায় অনুপস্থিত।

মেঘনাদ বধ কাব্যে'র অন্যতম অমর নারী চরিত্র সীতা। যার জন্য *মেঘনাদ বধ* কাব্যই শুধু নয়, রামায়ণ কাহিনীও রচিত হয়েছে। *মেঘনাদ বধ* কাব্যের চতুর্থ সর্গে যখন আমরা সীতাকে দেখলাম তখন- 'ভাসিছে কনক লঙ্কা আনন্দের নীরে..... কেহ বা সুরতে রত, কেহ শিধু পানে।' সেখানে-

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,/ কাঁদেন রাঘব বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে/ নীরবে।[১৮]

এ নীরব কান্নার সুর মধুসূদন কান পেতে শুনেছেন। তাই-তো তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ব্যাপক অংশ জুড়ে রয়েছে সীতা প্রসঙ্গ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সীতা সম্পর্কে কবির মনোভাব প্রায় অপরিবর্তীত থেকেছে। সীতা জননী কিংবা প্রেমিকারূপে দেখা দেননি। "সীতা নিগৃহীতা নারীত্বের প্রতীক। পুরুষ প্রধান ভারতীয় সমাজে সীতা অভাগিনী নারী জাতির প্রতিনিধি।"[১৯] রাজতান্ত্রিক সমাজে এসব মহীয়সী নারীও খামখেয়ালের শিকার হয়েছে। শকুন্তলাও এমনিভাবে নিগৃহীতা হয়েছিল।

মেঘনাদ বধ কাব্যে রাম কবির নিকট চরম ঘৃণিত। কিন্তু সীতা? শুধু *মেঘনাদ বধ* কাব্যেই নয় সমস্ত সাহিত্যিক জীবনে তাঁর সহানুভূতিতে সীতা উজ্জ্বল। সীতার জীবনের সমস্ত দুঃখবেদনা কবির হৃদয়কে আলোড়িত করে। তাই তাঁর প্রিয় রাবণের ধ্বংসের কারণও হয় সীতা হরণ। কেননা রেনেসাঁসের কবি মধুসূদনের নবজাগৃতি-লব্ধ মানস-প্রবণতা জনমদুখিনী সীতার প্রতি এখন মুগ্ধ।

এ সীতা সম্পর্কে যৌবনে *ক্যাপটিভ লেডিতে* কবি বলেছিলেন,

Or how to beauty's lonely bower/ The false one came at noon-tide hour

And pluck its brightest fairest Hower/ And on his aery-wheeled car
---
That he would rross The ocean-wave/ And make fair lunk a all a grave.[২০]

মধুসূদনের পরবর্তী কাব্য এবং কবিতায় সীতা যে প্রভাব ফেলেছে তার ভিত্তি এখানেই গড়ে উঠেছিল। *পদ্মাবতী* নাটকেও সীতাদেবীর প্রসঙ্গ আছে। সীতার জন্য নায়িকা পদ্মার হৃদয় বিদীর্ণ হবার মধ্যে যেন কবিরই অন্তরের বেদনা প্রকাশিত:

> অশোক কাননে সীতাদেবী রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদছেন। আহা, যেন সৌদামিনী মেঘমালয়ে বেষ্টিত হয়ে রয়েছে। কিম্বা নলিনীকে যেন শৈবালকুল ঘেরে বসেছে। আর ঐ যে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখ্চ, ও পবনপুত্র হনুমান্। দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টি ধারার মতন অনর্গল পড়ছে। সখি, এ সকল ত্রেতা যুগের কথা, তবু এখনও মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।[২১]

সীতাদেবী সর্বত্রই মধুসূনের সহানুভূতিতে উজ্জ্বল। তাই-তো অশোক কাননে বন্দিনী সীতার প্রতি বিভীষণ পত্নী সরমার মুখ দিয়ে যে বাণী উচ্চারিত হয়, তাতে নারী সম্পর্কে তাঁর হৃদয়বোধই প্রকাশিত হয়েছে:

আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া/ সিন্দুর, করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে/ এ বেশ?[২২]

সীতার প্রতি মধুমানস নমনীয়, শ্রদ্ধান্বিত। আর এ চরিত্রে সর্বপ্রকার কমনীয় মাধুর্য আরোপ করে কবি সীতাকে করেছেন মহিমামণ্ডিত। সীতার ধারণা তাঁর কারণেই অযোদ্ধাপুরীতে আজ অশান্তির আগুন, আবার লঙ্কার ধ্বংসের মূলেও তিনি। তাই পরম শত্রু রাবণি ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে তাঁর মুক্তির পথ উন্মুক্ত জেনেও কাব্যের নবম সর্গে সীতার দীর্ঘশ্বাস:

কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি/ সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমঙ্গলারূপী/ আমি। .....
..... হ্যাদে দেখ হেথা/ মরিল বাসবজিৎ, অভাগীর দোষে,
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে।/ মরিবে দানব বালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্যে। ...../..... রক্ষকুল শোকে সে অশোক বনে/ কাঁদিলা রাঘব বাঞ্ছা দুঃখী পরদুঃখে।[২৩]

সীতার এ কোমল পেলব মনই হয়তো কবিকে আকর্ষণ করে। তাই তাঁর কাব্যে সীতা বন্দিতা। রাবণের সমস্ত ঐশ্বর্যের স্বপ্ন সাম্রাজ্যে কবিমন বিচরণ করে। কিন্তু সীতা হরণ যে তার পাপ, মুর্হূর্তের ত্রুট তাতেও তাঁর সন্দেহ নেই। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা নব-জাগৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মধু-চেতনায় তা সর্বক্ষণ সক্রিয় ছিল। নারীর সম্ভ্রমের প্রতি এ শ্রদ্ধা আধুনিকতা এবং সভ্যতার লক্ষণ। রেনেসাঁসের 'তরঙ্গস্পর্শ-স্পন্দিত' কবিচিত্ত জানে নারীত্বের প্রতি সামান্য অসম্মানও প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষের জীবনে কলঙ্ক। এ জন্যই প্রতাপ-প্রদীপ্ত রাবণের জীবনে মহৎ ব্যর্থতা বয়ে আনল ঐ অশালীনতা। তাই পরবর্তীতে যে তিনটি চতুর্দশপদী কবিতায় সীতা প্রসঙ্গ এসেছে- সেখানেও সীতার প্রতি সহমর্মিতায় কবি অকুণ্ঠ:

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,/ বৈদেহি! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক কাননে,/ চারিদিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা

আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে।[২৪] (সীতাদেবী)

আর একই কারণে কবির প্রিয় রাবণকে তিনি অভিমান ভরে বলেছেন:

কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে/ রাক্ষস? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে ![২৫]

এখানেই প্রিয় রাবণের ট্রাজেডির মূলবীজটিকে তিনি সযত্নে নিহিত করেছেন এবং নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় এ বীজকে সফল করে রাবণকে অনিচ্ছাকৃত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছেন কবি।

বীরাঙ্গনা কাব্যের মধ্যে দিয়ে মধুসূদনের নতুন বলয়ে উত্তরণ। নারীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এ কাব্যের পৌরাণিক নারীরা। তারা খুলে ফেলেছে পুরোন খোলস, তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে নতুন দীপ্তি নিয়ে, যুগচেতনার আলোতে স্নাত হয়ে। এ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারীরা হলো- শকুন্তলা, তারা, রুক্মিনী, কেকয়ী, সূর্পনখা, দ্রৌপদী, ভানুমতি, দুঃশলা, জাহ্নবী, উর্বশী ও জনা। এ ১১ জন নায়িকার ১১টি পত্র *বীরাঙ্গনা* কাব্যের দেহ সৌষ্ঠব গঠন করেছে। প্রতিটি পত্রই প্রেমের বিচিত্র রূপ ও রসে সমৃদ্ধ। পত্রগুলোর মধ্যে নায়িকাদের যে স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে- তা সমালোচকের দৃষ্টিতে যথার্থরূপে ধরা পড়েছে:

> একদিকে বিবাহিত প্রেমের মধ্যে পূর্বরাগের রোমান্স সৃষ্টি, অপরদিকে অন্তরাগের ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস যেমন মধুসূদনের কবিতায় রূপ পেয়েছে, তেমনি আবার একদিকে তারা বিবাহিত জীবনকে অস্বীকার করে মুক্ত প্রেমের সন্ধানে ছুটেছে, এবং অপরদিকে উর্বশী স্বাধীন, মুক্ত বীরাঙ্গনার জীবনকে পার্থিব প্রেম সম্পর্কের মধ্যে সংহত ও সংকুচিত করবার বাসনা প্রকাশ করেছে। সর্বত্রই হৃদয়ের একাধিপত্য। আর কারও নির্দেশ মানব না। বাইরে থেকে আরোপিত সুখ ও ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করব, নীতিবোধ ও সমাজবোধকে দূরে সরিয়ে দেব, কেবলমাত্র প্রেমকেই সর্বশক্তিমান বলে জানব, হৃদয়ের নির্দেশই মাথা পেতে গ্রহণ করব। এ হৃদয়ের নির্দেশ মানতে গিয়ে ভানুমতি ভীতি দৌর্বল্যের পরিচয় দিয়েছে, জনার অত্যাধিক সাহস আত্মমর্যাদার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, দ্রৌপদী মাতৃভক্তি, ধর্মবোধ ও পঞ্চস্বামী সম্ভোগের অন্তরালে কেবল একজনের একান্ত ভালোবাসার জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে, তারা ঋষি-পতীকে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করে ঘর ছাড়বার জন্য পা উঠিয়েছে, উর্বসী দেবরাজ দত্ত সুধাপাত্রটি ভ্রূভঙ্গীসহ ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে মুক্ত স্বাধীন বিলাস পক্ষ দু'টি গুটিয়ে সংসার পিঞ্জরে আশ্রয় চাইছে, রাজকুমারী সূর্পনখা নিভৃত শয়নকক্ষ ছেড়ে গোদাবরীর তীরে প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় রাত্রিযাপন করেছে। সর্বত্রই প্রেমের জয়, হৃদয়ের অনন্য-পারতন্ত্র্য সাধিত হয়েছে।[২৬]

এ বিচিত্র বৈশিষ্ট্যধারী নায়িকা সৃষ্টিতে মধুসূদনের স্বাতন্ত্র্য অভাবনীয়। লক্ষণীয় যে, *বীরাঙ্গনা কাব্যে*'র নায়িকারা কেউ বীর নন। তাদের চরিত্রের মধ্যে বীরাঙ্গনার অভিধানিক শব্দার্থ অনুপস্থিত। কিন্তু গূহ্যার্থে শব্দটি অধিক ব্যঞ্জনাবাহী। এর বুৎপত্তিগত অর্থ নয়, বরং গূহ্যার্থের মধ্যেই কাব্যের নামকরণ তো বটেই, সেই সঙ্গে মধুমানসেরও ঘটেছে সার্থক উদ্ভাসন।

মধুসূদনের অন্বিষ্ট ছিল নারীর সৌন্দর্য এবং শোভনতার বৈচিত্র্য দান, সেই সঙ্গে নারীর যথাযথ মর্যাদা প্রদান। তাই তাঁর কাব্য নায়িকারা পৌরাণিক বাতাবরণ অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে স্বাতন্ত্র্যময়ী। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের জীবন ও শিল্পচেনতায় কবি *বীরাঙ্গনার* দেহসৌষ্ঠব গঠন করেছেন। এ কারণেই তারা, সূর্পনখা, কেকয়ী, জনা প্রভৃতি পত্র লেখিকা- তাদের পত্রে শাশ্বত এবং চিরানুগত্যের প্রতি বিদ্রোহ করেছে; সেই সঙ্গে সমাজদ্রোহী স্বাধীন প্রেম এবং আপন

মনোভাব প্রকাশে দ্বিধাহীন দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। আর এ জন্যই তারা হয়ে উঠেছে কালোত্তীর্ণ। লক্ষীবাঈ কিংবা প্রীতিলতার মতো এসব নায়িকা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়েও বীরাঙ্গনা।

শকুন্তলা পত্র লিখেছে দুষ্মান্তের প্রতি। কারণ দুষ্মন্ত 'গন্ধর্ব্ব- বিবাহচ্ছলে' শকুন্তলাকে ছলিয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছে। তাই সে প্রিয়-মিলন আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলচিত্ত। কিন্তু সে মিলনের কোনো আশা নেই। তার কেবলই অনুভব-

কি লোভে ধাইবে/ আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,-
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে।[২৭]

এ শুধু শকুন্তলার অন্তরের 'অনুভব'-ই নয়; এটি কবির একালের জীবন জিজ্ঞাসা। কারণ 'সু-সময়ের বন্ধু'র এখনো হয় না অভাব। শকুন্তলার 'যৌবন-মধু নিকুঞ্জ বাসরে' পান করেছে দুষ্মন্ত। কাজেই দুর্বাসা মুনির অভিশাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলে গেলেও কবির দৃষ্টি সেদিকে এতটুকুও ইঙ্গিত করেনি; বরং যৌক্তিকভাবে যা সম্ভব এবং স্বামীর দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যের অভাবে রমণী হৃদয়ের যে প্রতিক্রিয়া, এখানে তা-ই প্রকাশিত।

কালিদাসের শকুন্তলা যখন 'ধ্যানস্থ ও আত্মবিস্মৃত' মধুসূদনের শকুন্তলা তখন ব্রীড়াকুণ্ঠিত তো নয়ই; বরঞ্চ কিছুটা প্রগলভ:

যে তরুর মূলে/ গন্ধর্ব্ব বিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জ ফুল শয্যা সাজাইয়া সাথে/ সেবিল চরণ দাসী কানন- বাসরে, -
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,/ ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ ধামে।[২৮]

কিন্তু শকুন্তলাকে নিয়ে চতুর্দশপদী কবিতা রচনাকালে কবির দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য না ঘটলেও- উপলব্ধির তারতম্য লক্ষণীয়। এখানকার শকুন্তলার দেহবল্লরী এবং সৌন্দর্যই কবিকে আকর্ষণ করে, তার চির-বিরহী সত্তা কবির অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে নি। কালিদাসের শকুন্তলা আপন হৃদয়ের কামনা ও বেদনা জানাতে কখনই এত সমুচ্চকুণ্ঠ নয়। কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলা উচ্চ কণ্ঠা। প্রেমের ক্ষেত্রে এ আত্মোপলব্ধি নতুন যুগের নারী সত্তার উজ্জীবনের প্রতীক।

এ কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চরিত্র তারা। তারা সোমের গুরুপত্নী। সোম তার নিকট সন্তান স্থানীয়, প্রেম নিবেদন করেছে উপযাচিকা হয়ে এবং নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার না করে। ধর্ম সাক্ষী করে যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে তাঁর মানসিক বৈশিষ্ট্য তারাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, কিন্তু সোমদেব নিজস্বগুণে তার মনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছেন বলে তারা বলতে দ্বিধাবোধ করে নি:

যেদিন, -কুদিন তারা বলিবে কেমনে/ সেদিনে, হে গুণমণি, যেদিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ, অতুল জগতে!/ যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশিকান্ত, সহসা ফুটিল/ নব কুমুদিনী-সম এ পরাণ মম
উল্লাসে, ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে।[২৯]

শুধু তাই নয়, তারা শুধু সোমদেবের প্রেমেই মুগ্ধ হননি, অকাতরে প্রেমিক হৃদয়কে আবৃত করে তাঁকে আহবান করেছে তার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন গাঁথতে। তারার এরকম প্রেম লিপ্সা দেখে সমালোচক এ পত্রের একটি বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

> একটি পত্র সর্বাধিক স্মরণীয়- সোমের প্রতি তারা। তারা গুরুপত্নী- চিঠি লিখেছেন উপযাচিকা হয়ে। প্রথমত তিনি বিবাহিতা নারীর আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন, দ্বিতীয়ত তাঁর প্রেমাস্পদ হোল তাঁর সন্তান স্থানীয়। তাই নিঃসন্দেহে তারা এক আশ্চর্য ব্যাপিকা নারী। বীরাঙ্গনা কাব্যের অন্তরজগত বিদ্রোহের ইচ্ছায় প্রোজ্জ্বল, তার অনেকখানি শিখা জ্বালিয়েছে তারার পত্র। নারী জাগরণ তখনও বাংলাদেশে প্রত্যাশিত, বাস্তবায়িত নয়। মধুসূদন তরুণ বাংলার বাস্তবে প্রত্যাখ্যাত স্বপ্নসাধ কাব্যলোকে চরিতার্থ করলেন।[৩০]

মধুসূদন পৌরাণিক উৎস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করলেও পত্রটি রচনাকালে কবি এর কাহিনী সম্পূর্ণ বদলে দিয়ে নতুন দৃষ্টি সহযোগে নারীর হৃদয় সত্য এবং তার মূল্য নির্ধারণে সচেষ্ট হলেন। যে তারা পূরাণে চন্দ্রের (সোম) দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিল, সেই তারা সোমের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে বলেছে:

> গুরু পত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,/ সুধানিধি, মুদি আঁখি ভাবিতাম মনে,
> মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণ পতি,/ মান-ভঙ্গ-আশে নত দাসীর চরণে!
> আশীর্ব্বাদ- ছলে মনে নমিতাম আমি।[৩১]

এটিই মধুসূদনের সৃষ্ট নারীর বৈশিষ্ট্য: এখানেই তাঁর নারী স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন প্রেমের ব্রতী।

'*তারা*' (৮০ সং) নামক চতুর্দশপদীতে আপত মনে হতে পারে এ যেন সোম এবং তারার পত্রেরই কাব্যিক বৈপরীত্য সৃষ্টি। অর্থাৎ এখানে সোম পূর্বরাগে ভাবিত হয়ে তারার সঙ্গে মিলন প্রত্যাশী। কিন্তু কবিতাটির ব্যঞ্জনা অন্যত্র। এখানে কবি নিজের অতৃপ্ত হৃদয়ে ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য সালিনী তারার সান্নিধ্য ও সাহচার্য কামনায় উন্মুখর।

বীরাঙ্গনা কাব্যে দু'টি পত্র কুমারীর প্রণয় পত্র: একটি রুক্মিনীর, অন্যটি সুর্পনখার। এরা পত্র লিখেছে যথাক্রমে দ্বারকানাথ এবং লক্ষণের প্রতি। কিন্তু পত্র দু'টির মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। কারণ রুক্মিনীর পত্র বিশুদ্ধ এবং দেহাতীত প্রেমচিত্রে ভরপুর। দৈহিক কামনা-বাসনায় প্রেমের বিশুদ্ধ রূপ এখানে কলঙ্কিত হতে পারেনি। বরং ব্রীড়া সংকুচিতা নারী রূপেই রুক্মিনীর দীপ্তি লাভ ঘটেছে। প্রথম প্রেমের লাজ-নম্র-ভয় সবকিছুই তার পত্রে উপস্থিত। কিংবা প্রথম প্রেম প্রকাশে তার অন্তরেও কম্পন অনুভূত-

> কি লজ্জা! ভাবিয়া দেখ, দেখ হে দ্বারকাপতি।/ কেমনে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে রুক্মিনী?
> স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায় এক জনে/ কায় মন:, অন্য জনে- ক্ষম গুননিধি![৩২]

অবশ্য এ প্রণয় যে একেবারেই ইন্দ্রিয়াতীত, তা নয়। তবে বিশুদ্ধ প্রেমের সমান্তরালে রুক্মিনীর প্রিয়মিলনের আকাঙ্ক্ষা মধুসূদনের নারীচেতনার আর একটি দিক উন্মোচন করেছে।

সূর্পনখা রাক্ষস-নন্দিনী। প্রেমের দেহজ-কামনায় তার পত্রটি পূর্ণ। তার প্রেম প্রবৃত্তিকে অতিক্রম না করে- দেহের চারপাশে একটি সালঙ্কার আবরণ চেষ্টায় রত:

> আইস মলয়-রূপে, গন্ধহীন যদি/ এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!

> আইস ভ্রমররূপে, না যোগায় যদি/ মধু এ যৌবন-ফুল যাইও উড়িয়া
> গুঞ্জরি বিরাগ রাগে।[৩৩]

কুমারী প্রেমের সলজ্জ আত্মপ্রকাশ এখানে অনুপস্থিত; বরং যৌবন-মদমত্ত বিলাসিনী নারীর কামচিত্র উন্মোচিত।

কিন্তু বাল্মিকী অথবা কৃত্তিবাসের রামায়ণের গ্রাম্য, বর্বর, বুদ্ধিহীন এবং কৌতুক-উপহাসের পাত্রী সূর্পনখা এখানে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতরূপে চিত্রিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কবির কৈফিয়ৎ-

> কবিগুরু বাল্মিকী রাজেন্দ্র রাবণের পরিবার বর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশমাত্র নাই। অতএব পাঠকবর্গ সেই বাল্মীকি-বর্ণিতা বিকটা সূর্পনখাকে স্মরণ পথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।[৩৪]

এখানেই কবির মানস সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। তিনি কোনো নারীকেই ধর্মাভাবে ভাবিত হয়ে নয়, বরং নবজীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর কাব্য নায়িকাদের সৃষ্টি করেছেন।

কেকয়ী আর একটি উজ্জ্বল চরিত্র- যার মধ্যে দিয়েও আত্মঅধিকারের চেতনা প্রকাশিত। ধর্মীয় সংস্কারের দিক থেকে সে স্বামী দশরথকে বিচার করেনি তাঁকে বিচার করেছে নারীত্বের আদর্শের দিক থেকে, তার পত্রে প্রকাশিত হয়েছে ব্যঙ্গ আর স্বামীর আদর্শের জন্য তিরস্কার, যা হিন্দু নারীর কাছ থেকে প্রার্থিত নয়। কেকয়ীর চরিত্রে ঈর্ষা আছে, অপগত যৌবনের জন্য দীর্ঘশ্বাস আছে, কিন্তু নিজের সত্যবোধকে জোর করে ঘোষণা করার সাহসও আছে:

> 'অসত্যবাদী রঘু-কুল-পতি/ নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে!
> ধর্ম-শব্দ মুখে, -গতি অধর্মের পথে!
> কিংবা
> নম্র-শিরে এবে/ উচ্চ কুচ! সুধাহীন অধর! লইল
> লুটিয়া কুটিল কাল, যৌবনে ভাণ্ডারে/ আছিল রতন যত, হরিল কাননে
> নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে![৩৫]

কেকয়ীর পত্রটিও প্রেম পত্র। কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বাৎসল্য প্রেম। স্বামীকে 'বিগত যৌবন সুধা' পান করিয়ে এবং মরণের-রোগে সেবা-শুশ্রুষা করে বর পেলেও, তা পালন করতে যখন দশরথ দ্বিধাগ্রস্ত, তখনই তাঁর সত্যভঙ্গ নির্দেশপূর্বক স্বামীকে তীব্র ভর্ৎসনা করে পত্র লেখে সে। কেকয়ী এখানে উনিশ শতকের নবজাগরণের এক সচেতন নারী, আত্মবিশ্বাসে অটল। অসংকোচে সে বলেছে:

> যাহা ইচ্ছা কর, দেব, কার সাধ্য রোধে/ তোমায়? নরেন্দ্র তুমি। কে পারে ফিরতে
> প্রবাহে? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীকে।/ চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
> ভিখারিনী যেনো দাসী! দেশ-দেশান্তরে/ ফিরিব, যেখানে যাব, কহিব সেখানে,
> 'পরম অধর্ম্মচারী রঘু-কুল-পতি।'[৩৬]

ভানুমতি ও দুঃশলা উভয়েরই পত্রে 'ভীতি দূর্বলতাই প্রধান'। তবে দু'জনার মনোভাব এবং স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন। ভানুমতির দূর্বলতা এবং ভীতির সাথে মিশ্রণ ঘটেছে মাহাত্ম্য ও সততার অনুঘটন। তাই ন্যায়-অন্যায় বোধ তার চরিত্রে স্পষ্ট:

> এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্ম্মতি,/ কাল-কালিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে।[৩৭]

তাই সত্যের জয় ঘোষণা করতেও সে অকুণ্ঠিত:

হায়, বৃথা আশা, নাথ! শৃগাল কি কভু/ পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে?[৩৮]

অপরদিকে দুঃশলার পত্রে ভীতির গলিপথে প্রবেশ করেছে ন্যায়নীতিবোধের অজ্ঞতা। তাই যুদ্ধরত স্বামীকে উপদেশ দিয়ে বলেছে,

এস শীঘ্র, প্রাণ সখে, রণভূমি ত্যজি!/ নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি।[৩৯]

মধুসূদন এ পত্র দুটিতে 'নর-নারীর প্রেম সম্বন্ধের বিচিত্র মানস সম্পদ'কে বিভিন্নভাবে বিধৃত করতে চেয়েছেন। প্রেমের এ বিচিত্র রূপকল্প নির্মাণে মধুসূদনের সাফল্য অসাধারণ। তাই ভানুমতি ও দুঃশলা চরিত্র দু'টিও লাভ করেছে স্বাতন্ত্র্যের অধিকার।

পঞ্চ-স্বামীর অধিকারী হয়েও দ্রৌপদী পত্র লিখেছে অর্জুনের নিকট। অর্জুন দেব-অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভের আশায় স্বর্গে-, আর দ্রৌপদীর প্রেম পূর্ণ পত্র স্বর্গ-অপ্সরার কবল থেকে স্বামী তথা পার্থকে রক্ষার প্রয়াস। নবজাগৃতির কবি সর্বত্রই মানবিক প্রেমের জয় ঘোষণা করেছেন। পঞ্চ স্বামীর ঘর অথবা পাঁচ জনের মন জয় করা এ যুগে অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু নারীর মন যে বহুজনের অন্তরালে একজনের পূজায় রত থাকে- এ পত্রটি তার উৎকৃষ্ট এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অর্জুনের দর্শন কামনায় দ্রৌপদীর হৃদয়ার্তি:

আর কি অধিক কব? দয়া যদি থাকে,/ আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে।[৪০]

স্বর্গ প্রেম নয়; বরং মানবিক প্রেম ও তার আর্তিই কবিকে করে অধিক বেদনাহত। এজন্য তাঁর সৃষ্টি নারী যুগজিজ্ঞাসায় উজ্জ্বল।

জাহ্নবী এবং উর্বশী দু'জনেই স্বর্গের বাসিন্দা। একজন দেবী, অন্যজন অপ্সরা। জাহ্নবীর পত্রে মানবিক প্রেমের মুক্তি লাভের উপায়, কারণ সে দেবতাদের প্রয়োজনে উত্থিত। অন্যদিকে উর্বশীর পত্রে মানবিক প্রেম এবং কামনার উদ্বেলতা।

স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর প্রেম উপাখ্যান কবিকে আকৃষ্ট করলেও তা মর্ত্য প্রেমের মর্যাদায় বিভূষিত। কবির নিকট স্বর্গের ঐশ্বর্য-সুখ সবকিছুই পরম-আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু এখানকার দেব-দেবী ও অপ্সরার হৃদয়হীন প্রেম ও কাম প্রবৃত্তি কবিকে আকর্ষণ করেনি, তাই তাঁর সৃষ্ট নায়িকা-উর্বশী মর্ত্য-মানব পুরুরবার প্রেম কামনায় অধীরা। দেব ভোগ্যা এবং বীরাঙ্গনা অপ্সরী কায়মন: উভয়'ই সমর্পণ করে মর্ত্য প্রেম ও সংসারের প্রতি আকুলা। এখানে দেহ কামনার তাগিদ আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে হৃদয় প্রাবল্যের ধারা।

কিন্তু *উর্বশী* (৬০ সং) নামক চতুদর্শপদীতে- উর্বশী হৃদয়হীন দেহ-কামনার ফেনিল-উচ্ছ্বাসে বেগবান। মধুসূদনের কাব্যের অধিকাংশ নারীই পৌরাণিক ; তা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল যেখানকার অধিবাসী-ই হোক না কেন- তাদের চরিত্র অপূর্ব মানবিক রসে সিদ্ধ। একারণেই উর্বশী চরিত্রটি হৃদয়ের আর্তিতে যেমন কামনার উন্মত্ততায় তেমনি প্রোজ্জ্বল।

জনা *বীরাঙ্গনা কাব্যে*'র আর একটি উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যময়ী চরিত্র। তার পত্র নিছক প্রেম পত্র নয়- বাৎসল্য প্রেমের আকর। স্বামীর প্রতি স্পর্ধিত আচরণে- কেকয়ীর মতো চিরানুগত্যের প্রতি

বিদ্রোহের আভাস এখানে বর্তমান। কিন্তু কেকয়ীর পত্র যেখানে স্থূল-স্বার্থ এবং দৈহিক কামনার ইঙ্গিতে ভরপুর, সেখানে জনা ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল। পুত্রের মৃত্যু -শোকের মধ্যে সে বীরত্বের মাঝে সান্ত্বনা খোঁজে, স্বামী নীলধ্বজকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু পুত্র হন্তাকে নিজ পুরে অতিথি দৃষ্টে স্বামীর প্রতি আনুগত্যের চেয়ে তার ব্যক্তিত্ব প্রখরভাবে জেগে উঠে-

কেন/ এ পাষাণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে/ অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে/ লোহিত?[৪১]

সাহিত্য ক্ষেত্রে নারী চরিত্রে এ ব্যক্তিত্বের আরোপ নতুন যুগসাধনার ফসল। মধুসূদনের জনা ব্যক্তিত্ব, নারীসুলভ পরচর্চা, সতীত্বের আস্ফালন, প্রতিবিধিৎসার উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা, প্রথানুগত্যের বিরুদ্ধতা ও সমাপ্তির আত্মক্ষয়ের প্রতিজ্ঞায় এ পৃথিবীরই মানবী। এ মানবী চরিত্র চিত্রণে মধুসূদনের কৃতিত্ব অসাধারণ।

মধুসূদনের *চতুর্দশপদী কবিতাবলী*'তেও বেশ কিছু নারী চরিত্র ঠাঁই নিয়েছে। এখানকার শকুন্তলা, তারা, সীতাদেবী, উর্বশী- প্রমুখ চরিত্র পূর্বেই প্রসঙ্গত আলোচিত হয়েছে। পৌরাণিক চরিত্র সুভদ্রাকে নিয়ে কবি দু'টি চতুর্দশপদী রচনা করেছেন। এ কবিতা দুটিতেও তাঁর নারী সম্পর্কিত মনোভাবের স্পষ্টত প্রতিফলন ঘটেছে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শে কাব্যের বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন নি, ভেতরে সঞ্চার করেছেন নতুন প্রাণের লাবণ্য। এ লাবণ্য এসেছে শুধু বাইরে থেকে নয়, মধুসূদনের অন্তর থেকে। বাইরের পরিবর্তন ভিতরে গ্রহণ করে তিনি একটি পূর্ণ অবয়ব নির্মাণ করেছিলেন। এ অবয়বে প্রাণ সঞ্চার করেছিল নারীত্বের প্রতি শুধু শ্রদ্ধা নয়, নারীত্বকে মহৎ করে বাস্তব সত্যে প্রতিষ্ঠিত করা। নারী তার কাব্যে দেবী নন, রক্তমাংসে উজ্জ্বল একটি পরিপূর্ণ সত্তা, সামগ্রিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। উনিশ শতকের নতুন চেতনালোকে এরা প্রতিষ্ঠিত সত্য।

তথ্যনির্দেশিকা

১. মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া প্রণীত রবীন্দ্র ছোট গল্পে সমাজ ও স্বদেশ চেতনা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৭৮ পৃ.-৯৭।

২. ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত- মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, পৃ.-২৫০।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ.- ২৫০।

৪. পূর্বোক্ত, পৃ.- ২৫৪।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ.- ২৫৪।

৬. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত- মধুসূদন কাব্য গ্রন্থাবলী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৭০, পৃঃ-৯৯।

৭. *তদেব*, পৃ.- ৯০।

৮. ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত– মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্য শিল্প, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৮২, পৃঃ-১১১।

৯. *তদেব*, পৃ.-৪০৫।

১০. *তদেব*, পৃ.-১৩৩।

১১. *তদেব*, পৃ.-১৭৫।

১২. *তদেব*, পৃ.-১৭৮।

১৩. *তদেব*, পৃ.-১৮০।

১৪. *তদেব*, পৃ.-২৪২-৪৩।

১৫. *তদেব*, পৃ.-২৪৬।

১৬. *তদেব*, পৃ.-২৪৬-২৪৭।

১৭. *তদেব*, পৃ.-২৪৭।

১৮. *তদেব*, পৃ.-২০১-২।

১৯. সুরেশচন্দ্র মৈত্র – মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ জীবন ও সাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৮৬, পৃ.-১৬৭।

২০. *তদেব*, পৃ.- ৬৩৪-৩৫।

২১. ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত– মধুসূদন রচনাবলী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭।

২২. *তদেব*, পৃ.-২০৩।

২৩. *তদেব*, পৃ.-৩৫৫।

২৪. *তদেব*, পৃ.-৫০৯।

২৫. *তদেব*, পৃ.-৫০৯।

২৬. ক্ষেত্রগুপ্ত– মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্য শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ.-৩৪৩।

২৭. *তদেব*, পৃ.-৪১১।

২৮. *তদেব*, পৃ.-৪১৩।

২৯. *তদেব*, পৃ.- ৪১৮-১৯।

৩০. সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত– মধুসূদন রচনাবলী, কলিকাতা ১৩৯০, পৃ.- ২০৩।

৩১. *তদেব*, পৃ.-৪২০।

৩২. *তদেব*, পৃ.-৪২৯।

৩৩. *তদেব*, পৃ.-৪৪২।

৩৪. ক্ষেত্রগুপ্ত– মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্য শিল্প, পূর্বোক্ত, পৃ.-২৬০।

৩৫. *তদেব*, পৃ.-৪৩৪।

৩৬. *তদেব*, পৃ.-৪৩৫।

৩৭. *তদেব*, পৃ.-৪৫৫।

৩৮. *তদেব*, পৃ.-৪৫৬।

৩৯. *তদেব*, পৃ.-৪৬৫।

৪০. *তদেব*, পৃ.-৪৫২।

৪১. *তদেব*, পৃ.-৪৭৭।